এক্সপো একাত্তর

এ-৬২৭২

একুশে
একাত্তর
গঁচাত্তর

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ
মহানগর পাঠাগার,
ওসমানী উদ্যান, ঢাকা-১০০০
সংযোজন সংখ্যা এ-৬২৭২
তারিখ ১৬-১২-৮৭ ডাক সংখ্যা ৮২১.৪৪১
৬৬৫
ক্যাটালগার ১৬ গ্রন্থাগারিক

তিতু চৌধুরী

প্রকাশক :—সাঈদুজ্জামান চৌধুরী
৪০ নং সাবেক শরাফৎগঞ্জ লেন,
ঢাকা—১২০৪।

৮৯১·৪৪১
৩৩এ

স্বত্ব :—প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ
মহানগর পাঠাগার,
ওসমানী উদ্যান, ঢাকা-১০০০
সংযোজন সংখ্যা ৬২৭১ ৮৯১.৪ ৩৩এ
তারিখ ১৩.৪২৮৯ ডাক সংখ্যা
ক্যাটালগার গ্রন্থাগারিক

প্রকাশকাল :—অগ্রহায়ণ ১৩৯৪ বাং

মুদ্রক :—জেবুন্নেসা মুদ্রণালয়
৪০ নং সাবেক শরাফৎগঞ্জ লেন,
ঢাকা—১২০৪।

মূল্য :—পেপার ব্যাকে—১৪ টাকা
বাঁধাই—১৮ টাকা

পরিবেশক :—জেবুন্নেসা লিঃ
৩৬ নং বাংলাবাজার
ঢাকা—১১০০।

মহানগর পাঠাগার

মগজ ধোলাইকৃত
এবং মগজ ধোলাই প্রক্রিয়া অধীনস্থ
বাঙ্গালী সন্তানদের মোহমুক্তির জন্য
উৎসর্গিত।

তিতু চৌধুরী

গ্রন্থকারের গ্রন্থরাজি

প্রকাশিত :—

দিগন্বেষা
উপলব্ধি
বহতা বৈচিত্র (১ম ও ২য় খণ্ড)
জীবন জিজ্ঞাসা (কবিতা)
একুশে একাত্তর পঁচাত্তর (কবিতা)
মুজিব হত্যার তত্ত্বকথা

যন্ত্রস্থ :—

আনন্দঘন উত্তরাধিকারীত্বের বিষক্রিয়া
বিপ্লব

গ্রন্থকারের দু'টি কথা

একুশে, একাত্তর এবং পঁচাত্তর সম্বন্ধে কিছু বলতে চাওয়ার অধিকার যেকোন বাঙ্গালীর পক্ষে জন্মাধিকার। সেই অধিকারই আমাকে বক্তব্য রাখার প্রেরণা যুগিয়েছে।

আমি অতীব দুঃখ সহকারে অবলোকন করেছি যে, একুশের চেতনাকে অবমূল্যায়ন করার মনোভাব, একাত্তরের সংগ্রামকে অবমুল্যায়ন করার মনোভাব এবং পঁচাত্তরের নৃশংসতাকে মহামূল্যায়নের মনোভাব কিছু তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের আচরণে প্রতিভাত হচ্ছে তা যেকোন বাঙ্গালীর মনে বেদনার কারণ হয়ে বিধছে।

আমার মনে হয়েছে তাদের আচরণ বাঙ্গালীত্ব বিনাশক এবং মৌলবাদমুখী চিন্তাধারার ফলশ্রুতি হতে উদ্ভুত। তাদের কাছে এই মাটির কৃতি সন্তান অপেক্ষা বিদেশী সন্তানরাই যেন অধিকতর প্রেরণা-উৎস। তাঁদের কাছে ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, মুজিব, সালাম, বরকত, রফিক, কিংবা নুর হুসেনের রক্তের চাইতেও যেন ফিলিস্তিনিদের কিংবা আফগান মুজাহিদদের রক্তের মুল্য অধিক। বিদেশাত্মবোধই যেন তাঁদের দেশাত্মবোধ।

আমার বলার বিষয় কিন্তু এ নয় যে, বিদেশীদের মহানুভবতায় আমরা মোহিত হব না। কিংবা বিদেশীদের প্রতি সহমর্মিতা পোষণ করবো না। আমি বলতে চাই, সহোদর ভাই-বোনের অবমূল্যায়ন-এর মূলে আত্মস্বার্থ কামনায়, বিদেশী আগ্রাসকদের করুণা কামনায় বিদেশী অর্চনায় বাড়াবাড়ি পাশবিক প্রক্রিয়ার নামান্তর মাত্র এবং উক্তরূপ প্রক্রিয়ায় আত্মনিবেদন পশুত্বে অবতরণ তুল্য। যেমন— এক খণ্ড মাংসের জন্য কুকুর করে থাকে।

বাংলাদেশের বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় যা প্রতীয়মান হবে তা হলো—আমরা উক্তরূপে পশুত্বে অবতীর্ণ হয়ে পড়েছি। আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের মহত্ত্বের চেয়ে বিদেশীদের কুটিলত্বে আকর্ষিত হচ্ছি অধিক। আমার দেশের পূর্ণিমা অপেক্ষা বিদেশী অমাবস্যা আমাদের চোখ ঝলসাচ্ছে অধিক।

আমাদের এই যে মনোবৃত্তি এর জন্য আমরা সাধারণেরা কিন্তু দোষী নই, দোষী আমাদের প্রধানেরা—যাঁরা আমাদের পরিচালনা করেন, যাঁরা আমাদের মনোবিকাশের দায়ীত্বে রয়েছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটা একটি মহাসত্য যে, আমাদের প্রধানেরা হয় বিদেশী, নয় বিদেশ-প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

কখনও যদি সর্বাত্মক দেশীয় এমন প্রধানের আবির্ভাব ঘটেছে তবে তার অকালধ্বংস অনিবার্যরূপে সংঘটিত হয়েছে বিদেশী প্রভাব-দাস দেশীয় স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা।

বাংলায় এই স্বার্থান্বেষী শ্রেণীটির সৃষ্টি হয় মূলতঃ দেশ বিদেশী শাসনাধীনে যাবার পর থেকে এবং তা কার্যকরীরূপে আত্মপ্রকাশ করে পাঠান আমল থেকে যা পরিপূর্ণতা লাভ করে ব্রিটিশ আমলে শাসন শক্তির দালালরূপে।

তারপর থেকে এই দালালরাই বাংলাদেশ শাসন এবং শোষণ করে আসছে আর তারাই প্রথিত যষা বলে প্রতিষ্ঠিত। এবং কোন বিরুদ্ধতা পরিদৃষ্ট হলেই নির্মম হস্তে তারা তা ধ্বংস করে থাকে। ক্ষুদিরাম থেকে শুরু করে নূর হুসেন পর্যন্ত সেই ধ্বংসলীলাই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

আমাদের পর প্রজন্মের এ বিষয়ে সুস্পষ্ট এবং সঠিক ধারণা থাকা বাংলাদেশের কল্যাণ নিশ্চিতির জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, আমাদের প্রচার ব্যবস্থা, আমাদের শাসন ব্যবস্থা, আমাদের ধর্মীয় ব্যবস্থা এমনকি আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থাও সেদিক দিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার উপলব্ধি এরূপই।

এই স-ব ব্যবস্থাই আমাদের পর প্রজন্মের মনন বিভ্রান্তকর। এই অবস্থার কুফল থেকে আমাদের সন্তানদের মুক্ত রাখতে হবে।

কিন্তু কেমন করে? একটি কথায় যদি এই কেমন করে'র সমাধান দিতে হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই বলতে হবে—

"কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষান বেদী।"

তিতু চৌধুরী

একুশে, একাত্তর, পঁচাত্তর

একুশে—
একাত্তর—
পঁচাত্তর—
শুধুমাত্র দিন নয়
নয় শুধুমাত্র বছর।

এ তিন—
অমর চেতনা তিন,
অনন্তকাল ধরে বাঙ্গালী অন্তরে
বহিয়া চলিবে
মর্ম জাতনার ইতিহাস বয়ে।

এ একুশে—
একটি তারিখ
একাত্তর—
একটি বছর
বাংলার ইতিহাসে রহিবে
চিরভাস্বর হয়ে।

বাঙ্গালীর তাহাদিগ্দেষণের
ব্যর্থকাম ষড়যন্ত্রই

একুশের ইতিহাস ;
আর ধরণী হতে বাঙ্গালীত্ব
চিরতরে মুছিবার
ঘৃণ্য সাধনাই
একাত্তরের প্রয়াস।

এ দুইই ছিল
শোষকের শাসন রক্ষিতে,
বাঙ্গালীত্বের অস্তিত্ব
পৃথিবীর বুক হতে
চিরতরে নিশ্চিহ্ন করিবার।

হলেও অবস্থিত এ দুই
দূরত্বে উনিশ বছর
মূল লক্ষ্যে ছিল
একাকার একুশে একাত্তর।

কিন্তু পঁচাত্তরের প্রকৃতি ভিন্ন,
ইহার পাশবিক প্রকাশ
ছিল পুঁজিবাদ রক্ষণে
শোষণ প্রক্রিয়া রক্ষিবার
মানবতাঘাতী বীভৎস বিকাশ।

কিন্তু—
আপাতদৃষ্ট সফলতা
এহেন বীভৎসতার
বাঁচিতে পারেনি কভু
এই ধরণীর বুকে—দীর্ঘকাল।

চেঙ্গিস খাঁ, নাদির শাহ
কিম্বা হিটলার, নীরো
আরো যত শোষণের রাজা,
বাঁচিয়ে রাখেনি ধরণী,
তাদের শোষণ প্রক্রিয়া।

বিত্ত লোভী কু-আশাগ্রস্ত
উচ্চাভিলাষীদের—
পঁচাত্তরের হেন ঘৃণ্য চক্রান্তও ফিরিবে
ব্যর্থ বুমেরাং হয়ে
তাদেরই ধ্বংস
হাতে লয়ে শেষে।

একুশে একাত্তর—
মানব-ইতিহাসের পাতায়
রহিবে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত,
অমর চেতনা হয়ে
মণিক্তা খচিত।

পচাত্তর ?—
বর্বরতার ঘৃণ্য কালিমায়
কলঙ্কিত হইয়া রহিবে
ভারাক্রান্ত করি
ইতিহাসের পাতা।

আটচল্লিশের বজ্রকণ্ঠে
ধ্বনিয়া উঠেছিল যে অমর ধ্বনি
'না—না' রবে, তা
একুশেরে করেছিল অন্তঃসত্ত্বা।

একাত্তরের প্রসব বেদনায়
প্রসবিল তাহা,
ক্ষত-বিক্ষত হলেও
সুন্দর স্নিগ্ধকায়
জীর্ণ-শীর্ণ এক শিশু
প্রাণমনভরা—
স্বাধীনতা।

যে শিশু অপেক্ষায় ছিল
সহস্র বছর ধরি,
দলিত মথিত বিবস্ত্র
মাতৃদেহ ঘিরি,

কখন কোন শুভক্ষণে
মায়ের লজ্জা নিবারণ করি
হাসি ফুটাইবে মাতৃবদনে
সেই স্বাধীনতা।

একাত্তরে হলো শেষ
সহস্র বছরের অপেক্ষা,
বিবস্ত্র থেকেও
প্রাণ ভরে প্রাণ খুলে
হাসিল মাতা।

ক্ষত-বিক্ষত শীর্ণকায়
সেই স্বাধীনতা আসি
পারিল না আহার দিতে
দিতে পারিল না বস্ত্র
কিম্বা মাথার উপর ছায়।

তবু অফুরন্ত হাসি ফুটিল
মাতৃবদন ভরা।
বুকে আশা
এই হয় এই হবে
আহার বস্ত্র ঠাঁই
এখনো যাহা নাই।

মুক্তাকলম পাঠাগার

দৃঢ় প্রত্যয়—
এখনো নাই তাতে কি
করবো, হবে—
আমরাই তো গোঁসাই।

এই যে আশা এ নূতন কিছু নয়
চিরন্তন ইহা,
কোন সার্থকতা
আপন সাধনাবলে অর্জিত হলে
স্বপ্নবিভোর অন্তর তখন
এমনই আশায় ভরে।

দুর্ভাগ্য বাংলার
দুর্ভাগ্য বাঙ্গালীর
আশা পূরণ হতে না হতে
বাধ সাধিল
পঁচাত্তর এসে।

যে বজ্র কণ্ঠের
"না—না" হুঙ্কারে
একুশে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে
জন্ম দিল স্বাধীনতায় একাত্তরে,

হন্তারূপী পঁচাত্তর আসি
সেই কণ্ঠ স্তব্ধ করি
পিতৃহীন করিল সন্তানে।

পঁচাত্তর ভাবিল
আর চিন্তা নাই,
এখন কাজ মোদের
নিশ্চিন্তে শোষণ করাই।

কিন্তু হে নৃশংস পঁচাত্তর
স্বার্থান্ধ বিভ্রান্ত তুই,
তাই ভাবছিস্ শোষণে তোর
আর কোন বিঘ্ন নাই।

কিন্তু চেয়ে দেখ্—
একুশে একাত্তরের অমর চেতনা
এখনো, এই ক্ষণে
আটচল্লিশের বজ্রকণ্ঠসম
এই অষ্টাশিতেও
দুর্বার দাহন-সমর্থ।

এখনো বাংলার আকাশে বাতাসে,
মানুষের কণ্ঠে,

মানুষের অন্তরে—
বরকত সালামের
বক্ষ-রক্ত মাখা চেতনা
টগবগ করে !

কণ্ঠমুক্তি, চিন্তামুক্তি
গণমুক্তির দাবীতে
বাংলার নূর হোসেনরা এখনো
বিলোয় প্রাণ রাজপথে।

স্বার্থ উন্মাদ পঁচাত্তর—
অচিরেই দেখিবি তুই
কালিমায় কলঙ্কিত
তোর ঘৃণ্য প্রয়াস
ব্যর্থতায় হইয়াছে বিনাশ।

—০—

একুশে—

একুশে ফেব্রুয়ারী উনিষ শ' বাহান্ন,
একটি বছরের, একটি মাসের
ছিল একটি দিন অতি সামান্য
কিন্তু কালে, একুশে
দিনমাত্র রহিল না।

বর্তিল—
বাঙ্গালীর উপলব্ধির ভাণ্ডারে
দুর্বার শক্তিরূপী
এক চেতনাতে।

আজ তার সাথে আর
বাহান্ন নাই, নাই ফেব্রুয়ারী।
একুশে, শুধুই একুশে
জমাট বাঁধা রক্ত না হয়ে
বহ্নি স্রোতরূপে
বিরাজিছে বাঙ্গালীর
তনুমনে মিশে।

আজ নহে আর তা
মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে
ছিটকে পড়া রক্তই শুধু,
আজ তা—
মাতৃবক্ষ বিদারিত
তাঁর কণ্ঠনিষ্পেষিত
হৃৎপিণ্ড ফেটে পড়া
অগ্নিবাহী গলিত লাভা।

না হলে—
ছিটকে পড়া সে রক্ত
রক্তই যদি শুধু হতো
কবে শুকিয়ে—
গুঁড়ো হয়ে উড়ে যেত
জানতোও না কেউ।

মাটির ইতিহাসে
কত গেছে এমন
এ তো নূতন কিছু নয়।
মাতৃভূমির ইতিহাসে
কত সন্তানের কণ্ঠ
ছিন্নভিন্ন এমন হয়,
হিংস্র শ্বাপদের
নিষ্ঠুর দন্ত নিষ্পেষণে।

বাংলার শস্য শ্যামল স্নিগ্ধ কান্তির
অমিয় কণ্ঠবাণী,
ইতিহাস হতে মুছে ফেলিবার,
একুশে, এমনি ছিল
একটি হিংস্র
অমানবিক প্রয়াস।

কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে
ব্যর্থ হলো তা প্রথমবার
শুধু এখানেই
এই বঙ্গে।

মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে
যে রক্ত পড়েছিল ছিটকে,
তা শুকিয়ে গুঁড়ো হয়ে
আকাশে বাতাসে কিম্বা কোথাও
বিলীন হলো না।

তার অগণিত রক্ত কণিকার
অসংখ্য বিদ্যুৎ-কণিকা
বঙ্গভূমির আত্মজ
প্রতিটি মৃত্তিকা কণারে
বিদ্যুতায়িত করি,

সৃষ্টি করেছিল তাহা
যে সঙ্গীত-তরঙ্গ,
তার মূর্তরূপ—
রূপ নিয়েছিল যে শ্লোগানে
তাহাই "জয় বাংলা" এই বঙ্গের।

"জ—য় বাংলা, বাংলার জয়"
এ শুধুই দুটি শব্দ নয়,
এ নহে শুধু উচ্চারণ,
এ যেন নদীবক্ষে মাঝির
নৌকায় দাঁড় সঞ্চালন,
হাতুড়ির ঠাস্ ঠাস্
তাঁতের খট্ খট্
সুতোরের খটাখট্
সব যেন চলমান কর্মমান,
'জয় বাংলা' ছিল
সেই গড়মান শ্লোগান।

সেই গড়মান স্রোতে
কত লক্ষ প্রাণ
অমরত্ব লভিল আত্মবলিদানে
জয় বাংলা মুর্তায়নে।

"আমার ভায়ের রক্তে রাঙ্গানো
একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি ?"
এ শুধু নহে একটি গান
কোটি বাঙ্গালীর মর্ম নিংড়ানো
ওরে তোদের তরে—এ যে
স্নেহপ্রীতি ভালবাসার বাণ।
বাঙ্গালীর প্রাণাধিক বঙ্গমাতার
এ যে মহামহিম সম্মান।

বাঙ্গালীর মনে
কোন দ্বিধা নাই
রক্ত ঝরায় বেদনা যতই থাক
ছিট্‌কে পড়া সেই রক্তে
অর্জিত হলো যে সম্মান
অমর অম্লান রাখিতে তা'রে
আ'রো রক্তদান,
এই রক্তসিক্ত মৃত্তিকা সন্তানেরা
করে তুচ্ছ জ্ঞান।

রক্ত ঝরায়
যদি এমনি হয়
তবে ঝরুক না আরো যত লাগে,

জাতীয় গ্রন্থাগার ঢাকা

স্বাধীন মৃত্তিকা সন্তানেরা
তাহাই বলে।

"আমার ভায়ের রক্তে রাঙ্গানো
একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি"
গণ্ড বেয়ে—অশ্রু হয়ে
যখন ঝরে—
কি গর্বে, কি তৃপ্তিতে
আমার নয়ন আসে বুঁজে
ভাবি, আমার ধমনীতেও তো
সেই মহান রক্ত প্রবাহে।

আমিও তো প্রয়োজনে
মায়ের তরে সে রক্ত
অনায়াসে দিতে পারি বহায়ে।

যে চেতনার ভর করি
একুশের হয়েছিল অভ্যুত্থান,
রাষ্ট্রভাষার গর্বই শুধু
ছিল না তাহার নিশান।

রাষ্ট্রভাষায় ভর করে
রাজনৈতিক স্বার্থই শুধু
নিশ্চিতকরণ

ছিল না একুশের
শুধুমাত্র পণ।

"আমি সেই দিন হবো শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।"
ছিল একুশের প্রান্তিক মনন।

কিন্তু হায়
এখনো নিরবধি উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল,
বাংলার আকাশে বাতাসে ধ্বনিছে
হলেও একুশের মনন তেমন!

তবে জানি নিশ্চিত করে
উৎপীড়িতের এই ক্রন্দন রোল
সময় আসিলেই ধ্বনিবে
উৎপীড়ক ধ্বংসী ধ্বনি হয়ে
আকাশে বাতাসে।

এই তো সেদিন আমার দুয়ারে
এসেছিল এক ভিখারিণী "ভিক্ষা দাও" বলে,
ভিক্ষার বদলে—"মাফ করো" শুনে
শুধালো, কেমন হবে সেদিন

তোমার এই সাততলা ভেঙ্গে
লুটে নেব যেদিন ?

শুনে আমি চমকালেও
সেই ক্ষণে বুঝেছিলাম
চমকানো বৃথা।
উৎপীড়কের তরে
সেই দিন নয়কো আর দূরে।

ইহাতো স্পষ্টই এখন—
নহিলে কোরানের অপব্যাখ্যা
আর মুসলিম জাহান বৈরিতার
ছলনাময় দুর্লঙ্ঘ্য ভীতি,
কেন ব্যর্থ হলো রুধিতে
একুশের চেতনার পথের দিশা।

কি অপচেষ্টাই না চলেছিল,
ইসলামের চেতনায় বিভ্রান্তি আনিয়া
একুশের চেতনারে দলিবার।

"ইসলাম খাৎরেমে হ্যায়" ধ্বনি
মুসলিম অধ্যুষিত দেশেই ধ্বনিত হলো,
মুসলিম ঐতিহ্যের নামে
বাঙ্গালী বধিতে
কোরানের মহাবাণীরে কলুষিত করে।

করেও এত সব অনাচার
একুশের মানববাদী চেতনা
ওরা রুখিতে পেরেছে ?
কি ঘৃণ্য সাধনা—
ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালীর মনে
ধর্মভ্রান্তি বিস্তারিয়া
করে শোষণের কামনা !

মুসলমান নামধারী
ঘৃণ্য কিছু শঠদল এমনি করে,
মুসলিম চরিত্রে চিরদিন কলঙ্ক লেপিছে,
তাদের বিলোপ অবশ্যই
সাধিতে হবে।

আমরা তো দেখেছি,
দেখেছে জগতবাসী,
মাতৃমুখ মুগ্ধ উদ্বুদ্ধ
একাত্তরের হাতে
"ইসলাম খাৎরেমে হ্যায়"
এই অপপ্রচার কেমন উলঙ্গ হয়েছে ।

তবুও কি আশ্চর্য !
পঁচাত্তরের উত্থান,
"বাংলায় ইসলাম প্রচারিব"

হেন বিভ্রান্তিকর শ্লোগান
আবার ইসলাম প্রধান এ দেশেই তুলেছে।

বুঝা শক্ত নয়
মুজিবের ক্ষমা-সুন্দর দৌর্বল্যের সুযোগে,
বধ্য আল-বদর, আল-শামস, রাজাকার
প্রাণ ফিরে পেয়ে,
ধর্মকে করিয়া বর্ম,
তাদের পাশবিক স্বার্থ সাধনে
আবার মাঠে নেমেছে।

মীর জাফর, মিরন সদৃশ দালাল,
যারা পর পদতলে স্বর্গ অনুভবে,
তাদের কারণেই চিরকাল যেমন
এবারও তেমন "উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল"
বাংলার আকাশে বাতাসে ভাসিছে।

তাই একুশের দুর্বার চেতনার প্রয়োজন
এখনও যায়নি অবসান হয়ে।
উৎপীড়িতের ক্রন্দনেরে বর্তাতে বজ্রকণ্ঠে,
তার অশ্রু জলেরে গলিত আগুনে,
আবার হয়েছে প্রয়োজন
লেলিহান চেতনা একুশের।

একুশের চেতনাসম উত্তপ্ত চেতনা
উৎপীড়িত জগতে নুতন নয়,
নুতন যা—
এই বঙ্গ ভূমিতে
নিপীড়িত হয়েও
সে চেতনা স্তব্ধ নয়।

সহস্র বছর—ক্ষয়েও এই বঙ্গে
সে "সত্যই" একুশের চেতনায়
মূর্ত হয়ে বিকশিত হয়।

উৎপীড়ক যতই হলো ভীষণ
চেতনা হলো ভীষণতর,
অতঃপর একাত্তরে
লক্ষ প্রাণের নৈবেদ্যে
তা মূর্ত প্রাণচঞ্চল হয়।

ধন্য বাঙ্গালী ধন্য
দুনিয়ার মত নিপীড়িত,
উল্লসিত, উচ্ছ্বসিত হয়ে
একথা কয়।

—০—

একাত্তর—

"এবারের সংগ্রাম
স্বাধীনতার সংগ্রাম"
একুশের চেতনা অবশেষে
৭ই মার্চ একাত্তরে
দুর্বার রূপ নিয়ে
আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলার আকাশ-বাতাস
কম্পিত করিয়া যবে
গর্জিয়া উঠেছিল
সেই রব সপ্ত,
কাঁপিয়া উঠিল শোষক চক্র
দিগ্বিদিক জ্ঞান তাদের
হইল বিলুপ্ত।

ভূমিকম্পে সন্ত্রস্ত মানবকুল
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেমন
লম্ফ দিয়ে পড়ে ছাদ হতে,
কত নীচে তা নাহি জেনে,
সে লম্ফে বাঁচিবে কি মরিবে
সে বিবেচনাও নাহি করে,

তোমার সে হুঙ্কারে হে মুজিব
তেমনি লম্ফ দিল,
বিলুপ্ত চেতন শোষককুল
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে।

আত্মস্বার্থে পরার্থ হনন,
নিশ্চিত সাধনে তাহার
বিপক্ষ নিধন,
এই পাশবিক মন্ত্রে দীক্ষিত শোষককুল
কর্তব্য স্থির করিল অনুকূল।

নিধন নিধন নিধনই ইহার
একমাত্র বিধান, সাধিতে
সে মন্ত্রের সাধন।

পঁচিশে মার্চ একাত্তরে
গভীর রাতে—তাই
নিধন প্রতিজ্ঞ পশুকুল
বন্দুক, কামান, ট্যাঙ্ক নিয়ে
নামিল পথে—
মনে আশা, বঙ্গের শির
এবার করি চির নতশির
লুণ্ঠিবে সুধা যত আছে হেথা।

ঘুমন্ত নিস্তব্ধ শহরে
মনে আশা লয়ে বাঙ্গালী
স্বপ্নে বিভোর
এই ভেবে যে—
পূর্ব পশ্চিমের দ্বন্দ্ব
চব্বিশ বছর পরে,
এহিয়ার কালে এসে
বুঝিবা মিটে যাবে
মুজিবের লৌহদৃঢ়
মনোবলের ফলে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও বাঙ্গালী
এতকাল পাঞ্জাবী বিহারী শোষিত হয়ে
নিঃশেষ হতে হতে প্রায়,
মুজিবের নেতৃত্বে বুঝি
বাঁচিয়া গেল শেষে।

দুরাশার মহাসাগরে
আশার আলো যেন
এহিয়ার আশ্বাসে হেরিয়া
বাঙ্গালী বিভোর যখন স্বপ্নে,
সেইক্ষণে,—
পঁচিশে মার্চ দুপুর রাতে
গর্জিয়া উঠিল সেইক্ষণে,

হারামখোর এহিয়ার কামান
বাঙ্গালীর সুখস্বপ্ন ছিন্নভিন্ন করে।
আগুন আর আগুন—
শহরের চারিধারে
লেলিহান শিখা মেলে
এগিয়ে চলে।

আকাশ চুম্বিছে আগুনের শিখা
আর তাহারই আড়ালে,
শত-সহস্র বন্দুক-কামানের
উত্তপ্ত শীর্ষক বর্তিকা
চারিদিকে ছুটে চলে—
স্বপ্নে বিভোর বাঙ্গালীর
মর্ম ভেদিয়া।

পুলিশ, বি,ডি,আর, ছাত্র
রাজারবাগ, লালবাগ, বিশ্ববিদ্যালয়
বুঝিতে না বুঝিতেই গেল
ছারখার হইয়া।

বাঙ্গালী-সাধারণ তখনও বুঝেনি,
স্তব্ধ, হতচকিত, বিমূঢ়
ভেবে পেলো না হলো কি
কি হচ্ছে বা হইবে কিবা।

বুঝিল—
অনেক পরে বুঝিল,
নরঘাতক এহিয়া
পালাইয়াছে অন্ধকারে
আপনার ঘৃণ্য প্রাণ লইয়া
তার হিংস্র পশু-অনুচরদের
বাঙ্গালী নিধনযজ্ঞে
লেলাইয়া দিয়া।

নরপশুর মনে ছিল আশা,
কিছুক্ষণ হয়ত লড়িবে,
ভেতো বাঙ্গালী কতক্ষণই বা
দাঁড়াইতে পারিবে
তার বিশ্বসেরা সৈনিকদের
নখরের আঁচরের তলে।
দেখিতে দেখিতে অসহায় বাঙ্গালী
পদতলে তার আত্মসমর্পিবে।
আত্মস্বার্থ উন্মাদ পশুরা সব
শক্তিগর্বে এমনই ভাবে।

কিন্তু বিধির বিধান তার বাম,
এহিয়ার হিংস্র চক্র
মাতৃপ্রেমে মহিমান্বিত বাঙ্গালীর

পদতলে লুটালো শেষে
ভাঙ্গিয়া খানখান।

মাতৃমুক্তির উচ্ছলতায়
"জয় বাংলার" পতাকা তলে
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বাংলার,
প্রবাহিল উদ্দীপ্ত আগ্নেয়গিরির
গলিত লাভা সম।

ভাসিয়া গেল,
এহিয়ার সকল দম্ভ চুরমার করে
তার বিশ্বসেরা হিংস্র নখর সৈন্যদল
তৃনকুটা সম সে স্রোতে।

স্তম্ভিত এহিয়া অতঃপর
এক মুহূর্তও পারিল না
অস্তিত্ব রক্ষিতে তাহার
জঙ্গী প্রধানরূপে পাকিস্তানে,
ভুট্টোর হাতে চলে পেল ক্ষমতা
সে প্রবেশিল গুহাতে।

এমন পার্বতিক প্রলয়
পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভাব্য হয়েছিল,
নিরস্ত্র, নিরন্ন বাংলায়
শুধুই মাতৃপ্রেম বন্যায়।

বাংলার অগ্নি-সন্তানেরা
মায়ের বক্ষ করিয়া খালি,
এক এক করিয়া যখন মাতৃশত্রু নিধনে
চলিল বাহিরিয়া
কহিল মা কেঁদে, বুকে তারে ধরে
ওরে ধন, যাসনে আমায় ফেলে
আমার বক্ষ খালি করে।

মায়ের বুকের ধন মাকে বলে,
মাগো কেমন করে এমন বলো,
মাকে নিয়ে মোর,
পশুর দল
খেলবে ছিনিমিনি
এও হাত গুটিয়ে
আমায় দেখতে হবে ?
কেন তুমি অধমেরে
জন্ম দিলে তবে ?
মাগো শক্ত করে মনটি তোমার
জন্ম আমার স্বার্থক করো
যেতে আমায় দিয়ে।

বুক চিরে মা,
বুকের ধন

ছেলেরে দিল ছাড়ি,
কহিল, যা তবে যা, বাছারা সব
দিলাম ছাড়ি—
দেশমাতৃকার ইজ্জত রক্ষী করি।

লাখো লাখো সন্তান তখন
মাতৃবক্ষ শুন্য করি,
মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে।

মায়ের ইজ্জত রক্ষার সে যুদ্ধে
কত লক্ষ অমৃত সন্তান
মুক্তিযুদ্ধের অমর কাহিনীতে
নাম গোত্রহীন হয়ে হারিয়ে গেল,
তার হিসাব কে দিতে পারে!

হিসাব নাইবা থাকলো,
তাই বলে,
তাদের প্রাণের মূল্যে গড়া
স্বাধীন মাতৃভূমিতে
বেঁচে আছি আমরা যারা
স্বাধীন হয়ে—
প্রতি পদক্ষেপে তাদের অমৃত পরশ
অনুভব করে,
তাদেরে ভুলিব কেমনে?

তবুও বলিতে হয়—
"বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি"
কথাটি সত্য যেমন
বিদেশী তরে,
দেশদ্রোহী মীর জাফর, মিরন
এ মাটিই প্রসবে
তেমনই সত্য এ।
শুধু কি প্রসবই করে ?
অগণিত সন্তানের সাথে
দুধে-ভাতে পোষেও তাদেরে।

তাই যদি নাহি হবে
তবে—
একাত্তরের আল বদর,
আল-শামস, রাজাকার
এই সব বাঙ্গালী কুলাঙ্গার
ত্রিশ লক্ষ ভ্রাতা বধি
আজো বেঁচে কেমনে রহে ?

এই সব ঘৃণ্য নরাধম
ধর্মকে বর্ম করিয়া
আজো আপনার স্বার্থ সাধিয়া
আজো বাংলার স্নিগ্ধ ভূমিতে
হিংস্রতা লয়ে বিচরে কেমনে ?

ইতিহাস জানে, বাংলার মানুষ
ক্ষমা-সুন্দর অন্তর নিয়ে মহামানুষ,
অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতনে
নিষ্পেষিত হয়েও
ক্ষমিয়াছে সহস্র বছর ধরে
নিষ্পেষক নির্যাতকে।

বাংলার এই মহামানবতা
একাত্তরের নির্যাতনও পারিল না
বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্নিতে।
আপন মহিমায় রহিল উন্নত
ক্ষমিল জাতঘাতী মাতৃদ্রোহী কুলাঙ্গার
এই সকল আল-বদর, আল-শামস, রাজাকারে।

আর স্মরণাতীত কাল হতে
হইয়া আসিয়াছে যাহা বার বার,
এবারও হইয়াছে তাহা।
হীনঘৃণ্য কীট দল
আবার আত্মপ্রকাশিল
জাতির খলরূপী আপন রূপে।

আল্লার নামে সরল জনগণ মনে
কূট-জাল বিস্তারি অবলীলাক্রমে

তাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা
আবার শুরু করে।

বাংলার মাটিতে
বাংঙ্গালীর সরলতার সুযোগে
চিরকাল এমনই ঘটিয়াছে
বাংলার ভাগ্যে, ইতিহাস জানে।

লাহোর-মৃত্যুকূপবাসী হয়েও
নিজের জন্য তৈরী কবর,
নিজ চোখে দেখেও
হিংস্র স্বভাব পাঞ্জাবীদের
ফায়ারিং স্কোয়াড হতে ফিরে এসেও
মুজিব—
প্রাণ দিল পরপদলেহী,
দেশদ্রোহী স্বদেশীদেরই হাতে।

তাই—
আমার প্রত্যয়—এ শুধু হত্যা নয়
এ নয় শুধু দেশপ্রেমের অবক্ষয়,
ক্ষমতালোভী চক্রের
ক্ষমতাগ্রাসী প্রক্রিয়াও শুধু নয়,
ইহার পিছনে ছিল

আন্তর্জাতিক আগ্রাসী প্রকৃতির
আগ্রাসন প্রতিবন্ধক নাশিবার
ঘৃণ্য কূট জাল।
প্রভাব চক্র যাহার
চিরকলঙ্কিত হয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

সে প্রভাবে বিভ্রান্ত হয়ে
আমাদের হতভাগ্য নির্বোধ সন্তানেরা
কালিমায় কলঙ্কিল এই পূণ্যভূমির
বিনম্র মৃত্তিকা,
পঁচাত্তরে পিতৃ হত্যা করে।

বধযোগ্য হলো
এই বিভ্রান্ত পিতৃহন্তাগণ,
তবু করুণা ধারায় পূর্ণ বাঙ্গালীত্ব,
বধিল না ওদের,
ক্ষমা করে দিল।

—০—

পঁচাত্তর

"ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার
সময়েও বলবো—
আমি বাঙ্গালী
বাংলা আমার ভাষা"

তোমার এই কথা
হে মুজিব—
শুধু তোমারই ছিল না
তুমি জানতে সে কথা।

তুমি জানতে
কত অমৃত সন্তান এই মন্ত্রে
আপন প্রাণ হাসিমুখে
বিলায়ে দিয়াছে অকাতরে
সহস্র বছর ধরে
মায়ের তরে।

আর তাই না,
বাঙ্গালীর রক্তে স্নাত
সোনার রঙ্গে রঞ্জিত কিরীট
শোভিত হলো

বাঙ্গালীর মাতৃভাষা
বাংলার শিরে
একুশের উত্থানে।

অতঃপর একুশের পর-প্রজন্ম
একাত্তরের রক্ত বন্যায়,
সর্বশেষ আগ্রাসক পাকিস্তান
ভেসে গেল চিরতরে
এই ভূমি হতে।

সহস্র বছরের প্রার্থিত স্বাধীনতা
প্রতিষ্ঠিত হলো হেথা,
হে মুজিব, তোমারই প্রভাব ধন্য
মত্ততায়।

তুমি আরোহিত হলে
এমন এক স্থানে
পৃথিবীর ইতিহাসে লেখা হলো যাহা
দুরারোহণযোগ্য একমাত্র বলে।

পুত্রসম দেশবাসী তব
ভাবিল এবার আর
ভাবিবার কিছু নাই।

"একদিকে শোষক
আর একদিকে শোষিত
আমি শোষিতের পক্ষে"
তোমার এই অমৃত বাণী—
বিমুগ্ধ দেশবাসী
বক্ষে করি ধারণ
ভাবিল—মহীরূহই যখন
রহিয়াছে ছত্রছায়া বিস্তারি
মস্তকোপর,
কেমনে আর স্পর্শিবে মোদের
শোষণের ঝঞ্ঝা-ঝর।

কিন্তু হায়! তবু বলিতে হয়
বিস্তার করেও ছত্রছায়া তব,
দেশবাসীর আশা বর্তিকা
রাখিতে দীপ্ত
তুমি হয়ে গেলে ব্যর্থ।

তোমার সকল কর্মের ভিত্তি
কণ্ঠমুক্তি, গণমুক্তি,
সহস্র বছর ধরি লালিত
বাঙ্গালীর স্বপ্নীল আশা,
স্বার্থক হতে হতে শেষে
বিভ্রান্তির মোহজালে হয়ে গেল আবিষ্ট।

আবার চিরাচরিত—
মগজ ধোলাই চক্র আসি
বাংলার আকাশ-বাতাস গ্রাসিছে যেন,
কি যেন আবার
চারি পাশ ঘিরে
ভিড়িতেছে ধীরে,
কি হবে, কি করিব
এমন বিভ্রান্ত—বোধ
অন্তর বাহির তাদের
ভেক্‌ভুক সর্পসদৃশ
গ্রাসিছে যেন।

এ সবই যে
মগজ ধোলাই-এর ফলশ্রুতি
সে তো বুঝি—বুঝি না শুধু
সহস্র বছরের সংগ্রামে
যে ক্লেদ বিতারিত হয়েছিল সেদিন,
আবার ফিরে এল তাহা
কোন ছিদ্রপথে
যেতে না যেতে দু'দিন।

সেকি মুজিবের মতিভ্রম!
বা পথভ্রষ্টতা তার।
কিম্বা ক্ষমতালুব্ধ
বিশ্বাসঘাতকতা তাহার?

সে সুযোগেই কি দালালের দল
শিকড় গাড়িল
পঁচাত্তরে আবার ?

তবে কি আমায় বলিতে হইবে
নিন্দুকের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে,
তোমার সেই "বজ্র কণ্ঠ"
এক হুঙ্কারে যাহা করেছিল নতশির
জিন্নাহর পর্বত প্রমাণ দম্ভ,
সে শুধুই ছিল সূচনা
মাতৃপ্রীতির পরিধানে
তোমার ক্ষমতালিপ্সা ?
তাই কি শেষে
সাম্রাজ্যবাদের কাছে,
সে ধ্বনি অবনমিত হলো
আপনার মহত্ত্ব বিকায়ে ?

তবু তা যদি সত্যও হয়—
বরকত, সালামের রক্ত,
একাত্তরের ত্রিশলক্ষ প্রাণ
আর সাতাশির নূর হুসেন,
সাম্রাজ্যবাদী শোষকের প্রভাবে
এরা বিন্দু হারাবে না কভু,
উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে বিরাজিবে
ইতিহাসের অনন্ত আকাশে।

আর তোমার সেই দুর্বার প্রতিবাদী কণ্ঠ
তোমার আমৃত্যু কর্মকাণ্ড,
রহিবে বিচারাধীন হয়ে
অনাগত কাল সকাশে।

তোমার ক্ষমা প্রাপ্ত
আল-বদর, আল-শামস, রাজাকার—
একাত্তরের মাতৃদ্রোহী কুলাঙ্গারগণ,
আবার প্রকাশ্য দিবালোকে
যেখানে-সেখানে ঘুরিছে ফিরিছে
স্বাধীন বাংলার সর্বনাস সাধিবার
সুযোগের সন্ধানে।

তাই প্রয়োজন দেখা দিয়াছে
নুর হুসেনের রক্তে, একাত্তরের মত
রাজপথ রাঙ্গাতে, আবার
এই সাতাশিতে।
এই প্রয়োজন,
কতকাল রহিবে প্রয়োজন
কে জানে ?

পাকিস্তানীরা চিরশোষণ কামনায়
চিরদাসে রূপায়িতে পূর্ববঙ্গরে—
চেয়েছিল বাংলার বাঙ্গালীত্ব
বিলীন করিতে,

পূর্বপাকিস্তানরূপী জোব্বাতে,
আর তার বহিরে উর্দুর জালে
ভাষারে তারবীর ফাঁদে।

আয়ুব, এহিয়া—
চেয়েছিল টেক্কা দিতে
বাঙ্গালীত্বের উপর এমনি করে।
স্বার্থসর্বস্ব যাযাবর বংশোদ্ভূত
মস্তিষ্কহীন আগ্রাসীগণ,
জানে তো না মাটির বন্ধন কেমন।
ওরা জানে, শুধু পেশীশক্তিই শক্তি
পশুরা জানে যেমন।

তাই পশুর ন্যায়ই চিরকাল
এখানে-ওখানে-সেখানে
শিকার খুঁজিয়া ফিরে
যথাজৈবিক প্রয়োজন।

তার এই আগ্রাসী নরাংমগণের,
জৈবিক প্রয়োজনেই প্রয়োজন
তদুর্ধ্ব সব কিছুতে অনীহা বোধন।
এদের সরল ধর্ম, সরল চিন্তন,
উদ্ভুদ্ধ, পরিকল্পিত, সাধিত
শুধুমাত্র সাধিতে জৈবিক প্রয়োজন।

জৈবিক প্রয়োজন—এমন এক প্রয়োজন
যার একমাত্র প্রয়োজন
শুধুই জৈবিক সাধন
কিছু নহে আর।
সম্মুখে তাহার
স্নেহ-মায়া-মমতা মানবতা
সবই বাতুলতা।

সেই সাধনায় পাকিস্তানী বর্বরকুল
খুঁজে নিল স্থানীয় বর্বর অনুরূপ
মীর জাফর, মিরন সদৃশ দালাল,
ইংরেজদেরই মত
এই মাটি হতে।

পাকিস্তানী আগ্রাসীগণ
যখনই পিঠে হাত বুলাতো ওদের,
গদগদ প্রাণে চাটিতে করিত শুরু
বুটের তলা তাদের।

নরাধম এই বাঙ্গালী শ্রেণীটির
বৈশিষ্ট্য এমনই যে,
সুযোগ পাইলেই
বিদেশীর পদলেহী হইবে অমনি।
এই শ্রেণীটি যেখানেই থাকুক
জন্মাক যেখানেই
এরা সেখানেও উদ্বাস্তু।

এদের হয় না মাতৃভাষা
কিংবা মাতৃভূমি।
বিদেশই যেন এদের দেশ,
পদতলবাসী এরা বিদেশীর।
বঙ্গে জন্মালেও ওরা বাঙ্গালী নয়,
পাকিস্তানী নয়, জন্মালেও পাকিস্তানে
স্বার্থের পদতলে এরা
আপন জাতীয়তা অনুভবে।

তাই সম্পদ ছড়ালেই
পদতলে এদের উপস্থিতি মিলে,
শক্তির পদলেহনেই এরা
সম্পদ আহরে।

তাই চিরকাল এই শ্রেণীটি
সম্পদ, শক্তির পদতলবাসী।
কন্যা, ভগ্নী, জায়া, মাতা,
মাতৃভূমি, মাতৃভাষা,
ন্যায়-নীতি-ধর্ম-দর্শন
সবই পণ্য
এদের সম্পদ লিপ্সায়।
এরা শোধরাবারও নয়,
মানুষেরও নিস্তার নাই
এদের লিপ্সা হতে।

মানব কল্যাণ রক্ষিতে
বধযোগ্য এরা তাই,
মানব ইতিহাস একথাই বলে।

বাঙ্গালী মন মরমী-দরদী
তাই বধযোগ্য হলেও
বাঙ্গালীর হাত উঠিল না বধিতে
এই কলঙ্কিত কীটে,
বরং প্রসারিল সে হাত
ওদের মস্তক রক্ষিতে
মুক্তিবাহিনীর রোষানল হতে।

এই সুযোগে—
স্বভাব-ধর্মে উচ্চাভিলাষী এই পদলেহী দল
বাঙ্গালীর হৃদয় বৃত্তির ছত্রছায়ায়
নিজের বৈশিষ্ট্য লয়ে
আত্ম প্রকাশে মনোনিবেশ করে।
পরাজিত নৃশংস একাত্তর আবার
এই সকল বধ্যদের মাধ্যমে
পাশবিক পঁচাত্তর রূপে
ধর্মকে বর্ম করি
আবার নামিল মাঠে।

দেশপ্রেমিক কিছু নির্বোধ বালকে
মাতৃ-রক্ষার্থে পিতৃ হত্যায়
উদ্বুদ্ধ করিয়া
বধিল মুজিবেরে।

আর সেই সাথে প্রচার করে
বাংলার মাটি, বাংলার মান
রক্ষিল নাকি
বিদেশ বিধর্মী হতে!

এই প্রচারের সাথে
মন্দির-মসজিদ-গীর্জাতে,
মগজ ধোলাই চলে
যেমন চলিত স্বাধীনতার আগে।
স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে
সমাজ চেতনার উৎস রাজনীতি
ছাত্র সমাজে নিষিদ্ধ হয়।

অজ্ঞ পিতা-মাতা যেমন বলে
পাঠ্য বই পড় শুধু,
আউট বুক নয়
তোমায় যদি বড় হতে হয়।

এই সব পদলেহী পরজীবীরা
আসলে সম্মোহিত শূন্যমস্তিষ্ক
তাই বুঝে না ওদের মগজও যে ধোলাইকৃত,
নহিলে বুঝিত, সহস্র বছরের নির্যাতন,
নিষ্পেষণ, লুণ্ঠন বাঙ্গালীর সম্পদ হরেও
জাতীয় চেতনাতে বিপর্যয়
আনিতে পারেনি কভু বিন্দুমাত্র।

আর তাই এই মাটিতে
জন্মেছে যুগে যুগে বার বার
সূর্যসেন, ক্ষুদিরাম, মুজিব
সালাম, বরকত, নূর হুসেন
যখনই প্রয়োজন হয়েছে।

বাঙ্গালীত্ব নয় কোন যুগের
ইহা মৃত্তিকা-বৈশিষ্ট্য এই বাংলার।
এ মাটির গন্ধ যার গায়ে আছে
এ মাটির কথা যে ভুলতে নাহি পারে,
হাসিয়া দিতে পারে প্রাণ
যে এই মাটির তরে
সেই বাঙ্গালীই অধিকারী বাঙ্গালীত্বের।

দুঃখিনী বাংলা মায়ের মহাগর্ব—
লুণ্ঠিত, নির্যাতিত, নিঃশেষিত হয়েও
তার এই সন্তানেরা
চির প্রতিজ্ঞ মায়ের সম্মান রক্ষিতে,
প্রাণ দিয়ে হলেও।

তবুও দেখা যায়
কিছু সন্তান ধনী হয়ে
অভিজাত কুসন্তান বনে যায়,
তারা দেশের স্বার্থ বলিতে
নিজের স্বার্থকেই শুধু বুঝে,

পূর্ব পুরুষ বিদেশাগত বলিতে
গর্ব-বোধ করার রোগে ভোগে।
এরাই সেই সম্মান লোভী পরপদলেহী,
অভিশপ্ত বাংলার এরাই অভিশাপবাহী।
বরকত, সালামের রক্তদানের চেতনা
উপেক্ষা করে, নূর হুসেনের রক্তে
রাজপথ রাঙ্গায়ে,
এরাই চলিতে পারে।

তবে একথা সত্য
সত্য সূর্যসম,
সম্পদ এদের যতই থাকুক
যতই থাকুক শক্তি হাতে,
ভিত পাবে না এরা—
কোন দিন এই বাংলার মাটিতে।

তাই হতেই হয় উচ্ছেদ এদের
এই মাটি হতে
সময় আসিলেই নিঃসন্দেহে।
কেননা, মাটি হতে বিচ্ছিন্ন
এই সব সম্পদসর্বস্ব,
পরগাছার মতই বাঁচে
মৃত্তিকাস্পর্শী মানুষের রক্ত শুষে।

আর যখনই মাটির মানুষ অনুধাবে
তার শোষিত রক্তের ইতিকথা,

ছুঁড়ে ফেলে দেয় গা ঝারা দিয়া
ঐ সব পরগাছা।
তখন ওদের ঐন্দ্রজালিক মোহজালের
কিছুই আসে না কাজে
তাদের বাঁচাতে
ঝেরে ফেলা হতে।

মাটির সন্তান হয়েও যারা
উদ্বাস্তুমনা রয়,
মানবতার রাজ্যে তাদের
স্থিতি কভু নাহি হয়।

পঁচাত্তর মনা ঘাতকগোষ্ঠী
বাংলার মানবতাবাদী মাটিতে
কভু পাবে না স্থিতি
একথা আমি নির্দ্বিধায় বলি।

সালাম, বরকত, নূর হুসেন
আর মুজিবের ধমনীপ্রবাহিত
মানবতাবাদী রক্ত
যে ভুমি করেছে সিক্ত,
সে পূণ্য ভূমিতে
ঘাতক স্থিতি রুধিতে
তাদের মাতৃপ্রেমধন্য রক্তের
দুর্বার প্রেরণাই যথেষ্ট।

হে পঁচাত্তর,
তুমি ঘৃণ্য,
তুমি মানব ইতিহাসের
একটি পাতাকে করেছ এতই জঘণ্য যে,
অনন্তকাল ধরে
পবিত্র হজ্বে ধর্মপ্রাণ মানুষ
শয়তানের শিরে
পাথর ছুঁড়ে যেমন,
পবিত্র পৃথিবীর মানুষ
তোমার মুখে ছিছি বলে
থুথু ছিটাবে তেমন।

হে বঙ্গবাসী—
প্রয়োজন তব জানা,
"ইসলাম খাৎরেমে হ্যায়" ধুঁয়ায়
আয়ুব-এহিয়ার
ব্যর্থকাম প্রয়াসের
লক্ষ্য ছিল যাহা,
"ইসলাম প্রচারিব" ধুঁয়া তুলে
পঁচাত্তরের অভ্যুত্থানও
কামনা করিছে তাহা।

তাই তব প্রজন্ম তরে, প্রয়োজন
যে কথাটির অনুধাবন

সে কথাটি—
"সত্য ধর্ম" প্রকৃত
রক্ষণ বা প্রচারে
ছলনা নিষ্প্রয়োজন তাহার।

ছলনার প্রয়োজন সেই ধর্মের
গোত্র প্রয়োজনে
মানবিক মননে
জন্ম হয়েছে যাহার।

সর্বশেষ কথাটি আমার
রহিল মুজিবের তরে।
তুমি দেশপ্রেমিক, আত্মত্যাগী
কিংবা বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট
কিংবা আত্মত্যাগের ছলনায়
সীমাহীন আত্মস্বার্থলোভী
কিংবা ছোট-বড়, ভাল-মন্দ
যাই হও তুমি,
আমি নমি তোমার নামে
এ মাটির আরো সন্তানের সাথে।

আমি ধন্য মানি মোরে
তোমার নামে নমিতে পেরে।

মহানগর পাঠাগার ঢাকা

জীবনের সকল সুখ
যে কারণেই হোক, যে ভাবেই হোক,
মূল্যরূপে দিয়ে
তুমিই পেরেছ
এনে দিতে ফিরে—
সহস্র বছর ধরি হৃত
মোর মাতৃক্রোড় মোরে।

দেশ বন্ধুর স্তবে
রবীন্দ্রনাথের যেকথা অক্ষয় রবে,
হে 'বঙ্গবন্ধু',
আমিও উচ্চারি তাহাই তব তরে
"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান"

—০—

মহানগর
পাঠাগার

গ্রন্থকারের গ্রন্থরাজি

প্রকাশিত :—

দিগন্বেষা
উপলব্ধি
বহতা বৈচিত্র (১ম ও ২য় খণ্ড)
জীবন জিজ্ঞাসা (কবিতা)
একুশে একাত্তর পঁচাত্তর (কবিতা)
মুজিব হত্যার তত্ত্বকথা

যন্ত্রস্থ :—

আনন্দঘন উত্তরাধিকারীত্বের বিষক্রিয়া
বিপ্লব